ওভারটাইম

কেন আমাদের সংক্ষেপিত
কর্মসপ্তাহ প্রয়োজন

boobook

boobook

উইল স্ট্রং
কাইল লুইস

ওভারটাইম

কেন আমাদের সংক্ষেপিত কর্মসপ্তাহ প্রয়োজন

ভাষান্তর · আনন্দ অন্তঃলীন

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

overtime: keno amader shongkhepito kormo shoptaho proyojon translation of will stronge & kyle lewis's overtime: why we need a shorter working week, by aananda antahleen, published by boobook, june 2023, dhaka, bangladesh.

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ইমেজটির আলোকচিত্রী চার্লস সি. এবেটস।

ISBN 978-984-97758-0-5

গ্রন্থস্বত্ব

ভাষান্তর © আনন্দ অন্তঃলীন
বই কপিরাইট © বুবুক

প্রথম বুবুক প্রকাশ • জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০, জুন ২০২৩

পরিবেশক • বুবুক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক • বইপত্তর

ডিজাইন ও অক্ষর বিন্যাস • noktaforge

মুদ্রণ পরিষেবায় • replikagrapiks.com

boobook

বাড়ি ২৪৬/এ, সড়ক ১০এ, পশ্চিম ধানমণ্ডি,
ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ

+৮৮০ ১৯১৯২৭৬৪৫৮
+৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

dak@boobook.co
www.boobook.co

প্রকাশনা ক্রম # সপ্তম

সূচিপত্র

৬
অনুবাদকের ভূমিকা:
একটি
উপেক্ষিত সংকট

২০
ভূমিকা:
যে সংগ্রাম পুঁজিবাদের
মতোই পুরনো

৩০
প্রথম অধ্যায়
কাজ-পাগল
সমাজে বসবাস

৪২
দ্বিতীয় অধ্যায়
আনকোরা সম্ভাবনা:
শ্রমসাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং
মানবীয় সমৃদ্ধি

৫৮
তৃতীয় অধ্যায়
নারীর সময় এবং
সংক্ষেপিত কর্মসপ্তাহ

৭০
চতুর্থ অধ্যায়
পরিবেশের
জন্য সময়

৮৪
পঞ্চম অধ্যায়
সংক্ষেপিত কর্মঘণ্টার
জন্য সংগ্রাম

৯৬ **টীকা ও তথ্যনির্দেশ**

boobook

অনুবাদকের ভূমিকা:

একটি উপেক্ষিত সংকট

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে তার শ্রমের ইতিহাস। শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ, পশুপালক সমাজ, উদ্যানপালক কিংবা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে বর্তমানের পুঁজিবাদী শিল্পায়িত সমাজ পর্যন্ত সকল অবকাঠামোগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে মানুষের শ্রমের দ্বারা। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমের বিভিন্ন রূপ ও কাঠামো দেখা দিয়েছে; তা বিবর্তিত হয়েছে মানব সমাজের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এবং তার সার্বিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ক্রমঃপরিবর্তনের সাথে সাথে। প্রথাগত মার্কসবাদী এবং বিবর্তনবাদীরা মনে করেন, আদিমতম সমাজে মানুষের শ্রম ছিল তৎকালীন সমাজের মতোই—শ্রেণিবিহীন এবং কর্তৃত্বমুক্ত; কৃষি সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উদ্ভবের মাধ্যমেই সমাজের যাবতীয় বৈষম্য ও শোষণের আবির্ভাব ঘটেছে। এবং কালক্রমে শ্রমিকের ওপর চালানো এই কাঠামোগত সহিংসতা এবং বৈষম্য পূর্ণরূপ পেয়েছে পুঁজিবাদের উৎপত্তির মাধ্যমে। পরবর্তীকালে নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, এবং সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ডগুলো যদিও 'আদিম সমাজতন্ত্রের' এসকল প্রস্তাবনাকে খারিজ করে দেয়, কিন্তু এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সবকালেই শোষিত হয়েছে। প্রাচীন সমাজের কিংবা ঔপনিবেশিক সময়ের দাস, মধ্যযুগের কৃষিজীবী ভূমিদাস, কিংবা শিল্পায়িত সমাজের মজুরিভিত্তিক শ্রমিক সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শোষণ ও বৈষম্যের শিকার।

২১ শতকের পুঁজিবাদী বাস্তবতায় আমরা যে ধরনের শ্রম লক্ষ করি তা মূলত মজুরিভিত্তিক শ্রম। এই ব্যবস্থায় শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁর মানসিক কিংবা কায়িক শ্রমকে বিক্রি করে থাকেন। এখানেই মালিক শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে। মালিকের অভিসন্ধি হয়ে দাঁড়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রমিকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদনক্ষমতা তথা মুনাফা আদায় করে নেওয়া এবং শ্রমিকের লক্ষ্য হয় মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আধুনিক পুঁজিবাদের উৎপত্তির সময় অর্থাৎ ১৮ শতক থেকেই মালিক শ্রমিকের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান। পুঁজিপতির জন্য শ্রমিকের সময় এখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার আরেকটি অংশ মাত্র। কিন্তু শ্রমিকের জন্য এই সময় হলো তাঁর

boobook

জীবনীশক্তি। এর ফলে পুঁজিবাদের শুরু থেকেই শ্রমিক শ্রেণি অধিক মজুরি, উন্নততর কর্ম পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক এবং কর্মসংস্থানগত নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি কর্মঘণ্টা হ্রাসের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ৮ ঘণ্টার কর্মদিবসকে একটি স্বাভাবিক বিষয় মনে হলেও এর পেছনে ছিল শ্রমিক শ্রেণির শত বছরের সংগ্রাম। এবং বর্তমানের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে এটাও স্পষ্ট হবে যে, বর্তমানে মানুষ যে পরিমাণ সময় কর্মক্ষেত্রে কাটায় তা একদিকে যেমন কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে যত সময় প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি, অন্যদিকে এই অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ক্রমাগত আমাদের সমাজের পরিবেশগত, অবকাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি করে চলেছে। এই গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জেন্ডারগত এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংক্ষেপিত কর্মঘণ্টার দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরা। কারণ, ২১ শতকের ভয়াবহ বাস্তবতায় কর্মঘণ্টার সংক্ষেপণ কেবল শ্রমিকশ্রেণির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নয়, তা মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম।

boobook

বইটি রচিত হয়েছে পশ্চিমা (বিশেষত যুক্তরাজ্যের) বাস্তবতা ও তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেসকল চিন্তা, তত্ত্ব, কিংবা উপাত্ত আমাদের নিজস্ব বাস্তবতা কিংবা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। বরং অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, কিংবা জেন্ডারগত যেসকল বৈষম্য, ধ্বংসযজ্ঞ, কিংবা কাঠামোগত সহিংসতার প্রসঙ্গ এই বইয়ে বিবেচিত ও আলোচিত হয়েছে, সবগুলোই আমাদের সমাজের ক্ষেত্রেও একই রকম কিংবা আরো বেশি প্রযোজ্য।

শিল্পায়ন ও শ্রমিকের কর্মঘণ্টা: প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ

পশ্চিমের দেশগুলোতে কর্মঘণ্টা হ্রাস কিংবা বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যে মাত্রায় আন্দোলন, সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হয়েছে, উপমহাদেশে কিংবা বাংলাদেশে তা সেই মাত্রায় হয়নি। এর কারণকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করা যায়। ইউরোপে ১৮ শতকে শিল্পবিপ্লব শুরু হলেও ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের আবির্ভাব

boobook

ভূমিকা:

যে সংগ্রাম
পুঁজিবাদের মতোই পুরনো

সোম থেকে শুক্র [কিংবা রবি থেকে বৃহস্পতি] পর্যন্ত কর্মসপ্তাহকে অধিকাংশ মানুষই স্বাভাবিক কিংবা সহজাত একটি বিষয় হিসেবে ধরে নিলেও তা আসলে একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি আবার অসমভাবে বণ্টিত; কারণ পৃথিবীর অনেক জায়গাতে শ্রমিকেরা নামমাত্র মজুরিতে সপ্তাহের সাতদিনই অতিরিক্ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক উত্তরের [global north] মানুষ যে ধরনের অবসর উপভোগ করে তা মূলত উনিশ ও বিশ শতকের শ্রমিকদের অবদান। অস্ট্রেলিয়াতে পাথর নিয়ে কাজ করা রাজমিস্ত্রীরাই [stonemason] ১৮৫৬ সালে প্রথম আট ঘণ্টার কর্মদিবস আদায় করে নিতে সমর্থ হয়।[১] মেলবোর্ন শহরের সম্প্রসারণের যুগে জেমস স্টিফেন্‌স ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের ১০ ঘণ্টার কর্মদিবসের কঠোরতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিকদের সাথে আলোচনাপূর্বক তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, নির্মাণ শিল্পে আট ঘণ্টার কর্মদিবস ঘোষণা করা প্রয়োজন।[২] শ্রমিকদের এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য কেবল বাক্য ব্যয় করাই যথেষ্ট ছিল না। ১৮৫৬ সালের ২১ এপ্রিলে স্টিফেন্‌স ও তাঁর সহকর্মীরা মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের চাকরি থেকে ওয়াক আউট করেন ও বেলভেদেয়ার হোটেলের উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করেন। পথে তাঁরা অন্যান্য নির্মাণ-শ্রমিকদেরও তাঁদের সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান এবং তাঁদের সাথে নিয়ে এগোতে থাকেন। তাঁদের ক্ষমতা ও ঐক্যের এই প্রদর্শনী শেষ হয় হোটেলে একটি ভোজসভার মাধ্যমে, যেখানে শ্রমিকেরা তাঁদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে অটল থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তী মাসগুলোতে শ্রমিকেরা তাঁদের নিয়োগকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের দাবি আদায় করতে সমর্থ হয়। স্থানীয় হেরাল্ড পত্রিকায় বলা হয়েছিল:

> [নির্মাণ শ্রমিকেরা] সফল হয়েছে, অন্তত নির্মাণ শিল্পে আট ঘণ্টার কর্মদিবস নিশ্চিত করার ব্যাপারে। নিয়োগকর্তারা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসাটাকেই যথার্থ মনে করেছে। তারা [নিয়োগকর্তারা] কোনো ধরনের বাকবিতণ্ডা ছাড়াই পূর্বের ১০ ঘণ্টা কর্মদিবসের সম-পরিমাণ অর্থ শ্রমিকের মজুরি হিসেবে দেওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি জানিয়েছে।[৩]

boobook

শ্রমিকদের এই ঐতিহাসিক জয়ের উৎসব [যা প্রাথমিকভাবে '৮ ঘণ্টার মিছিল' নামে পরিচিত ছিল] পরবর্তী ৯৫ বছর যাবৎ স্মরণ করা হয়েছিল এবং এটিকেই আন্তর্জাতিক 'শ্রম দিবস' উদযাপনের সাথে একত্রিত করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার নির্মাণ শ্রমিকদের উদাহরণ [এর পাশাপাশি কর্মঘণ্টা সংক্রান্ত অন্যান্য আন্দোলন] আমাদের অন্তত দুটি বিষয়ের শিক্ষা দিতে পারে। একটি হলো, কাজের দুর্বিষহ অবস্থা থেকে আমাদের কখনোই আপনাআপনি মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয় না; তার জন্য দাবি তুলতে হয়, লড়াই করতে হয়। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে এটাও বোঝা যায় যে, কর্মঘণ্টা হ্রাস করার দাবি যেকোনো ধরনের পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষেরই দাবি, তা পুঁজিবাদের যে-পর্যায়েই হোক না কেন। সেই সময়ের নির্মাণ শ্রমিকদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল [আমাদের কাছেও তা যেমন স্পষ্ট] যে, বিশ্রাম নেওয়া, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, ব্যক্তিগত কাজে মনোনিবেশ করা এবং সর্বোপরি, কর্তৃপক্ষের শোষণ কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা থেকে নিস্তার পাওয়া, এর সবই মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সাথে সম্পর্কিত। শেষ পর্যন্ত, এই সময়ই জীবন।

boobook

কর্মঘণ্টা এখনও একটি সমস্যাজনক বিষয়

কর্মক্ষেত্রে আমাদের ব্যয় করা সময় সংক্রান্ত যন্ত্রণা ও জটিলতা কেবল ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ থাকার মতো প্রসঙ্গ নয়। সংক্ষেপিত কর্মসপ্তাহের দাবি পুনরায় রাজনৈতিক বিষয়সূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক উত্তরের [global north] রাজনীতিবিদরা আবারো এই রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা ঘটিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিয়ো-কোর্তেজ, ফিনল্যান্ডের সানা মারিন, যুক্তরাজ্যের সাবেক শ্যাডো চ্যান্সেলর [Shadow Chancellor] জন ম্যাকডোনেল এবং নিউজিল্যান্ডের জ্যাসিন্ডা আর্ডার্ন এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[৪] জার্মানির আইজি মেটাল [IG Metall], যুক্তরাজ্যের যোগাযোগ শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং ফিনল্যান্ডের ফোর্সার [Forsa] মতো বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মঘণ্টা হ্রাসের দাবিতে তাদের আন্দোলন পরিচালনা করে আসছিল। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিভিন্ন জায়গায় গণ-বেকারত্ব দেখা দিলে সেই আন্দোলন আরো বেগবান হতে শুরু করে এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোও তাতে যোগদানে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১

boobook

কাজ-পাগল সমাজে বসবাস

ক্লান্ত দাসের দীর্ঘশ্বাস, যে নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহৃত ও শোষিত হয়েছে কেবল একটি যন্ত্র কিংবা ভারবাহী জন্তু হিসেবে। মধ্যযুগের ভূমিদাস, যাকে আটকে রাখা হতো তার মনিবের জমির সাথে, যেন সে কোনো আসামী; যাকে তার মনিবের সকল কাম-ক্রোধের শিকার হতে হতো। আধুনিক মজুরি শ্রমিক, যার নিজের শ্রম ছাড়া কিছুই বিক্রি করার নেই; তার মনুষ্যত্ব যেন কেবল একটি খোলস, দুমুঠো খাবারের জন্য যে নিজেকে বাজারে বিক্রি করে দেয়। দাসত্বের এই তিন ধাপ—যেগুলো তাদের নিজস্ব সময় ও বাস্তবতায় অনিবার্য ও অবধারিত—সকল প্রকারের দাসত্বের সম্ভাবনাকে ক্ষয় করে ফেলবে। এবং অবশেষে মানবজাতি অবসর খুঁজে পাবে; ভারবাহী পশুর মতো নয়, বরং প্রকৃত অর্থেই মানুষ হিসেবে তার জীবনযাপন করতে পারবে।[১]

১৯১২ সালে ব্রিটিশ শ্রম আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে দক্ষিণ ওয়েলসের খনি শ্রমিকদের অনানুষ্ঠানিক কমিটি একটি শক্তিশালী ইশতেহার প্রকাশ করে। এর লেখকেরা [যাঁদের মধ্যে ছিলেন খনি শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নোয়া অ্যাবলেট, এ.জে. কুক, উইলিয়াম হেনরি মেইনওয়ারিং প্রমুখ], ইশতেহারটির মাধ্যমে খনি শিল্পের ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা চালান। এই ইশতেহার হাড়ভাঙা শ্রম ও গোলামিমুক্ত এমন একটি ইউটোপিয়ান জগতের কথা বলেছিল, যা আজও প্রাসঙ্গিক। তারপরও এটির একটি দিক রয়েছে, যাকে কালব্যতিক্রম [anachronistic] মনে হতে পারে। মার্কসবাদ ও সিন্ডিকালবাদ প্রভাবিত এই ইশতেহার কেবল উন্নত মানের চাকরির কথাই বলে না, একই সাথে এমন একটি ভবিষ্যতের দাবি তোলে, যেখানে আমরা আর মজুরির জন্য কাজ করতে বাধ্য হব না।

কর্মবিহীন সময়ের জন্য সংগ্রাম পুঁজিবাদের উদ্ভবের সময় থেকে, অর্থাৎ প্রায় ৪০০ বছর আগে থেকে ঘটে চলেছে। কিন্তু কেন? কেন 'সময়' এত সংঘাত, দর কষাকষি ও প্রতিযোগিতার একটি বিষয়? এর উত্তরের একটা বড় অংশ নিহিত রয়েছে আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে মৌলিক পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। আমরা এখন আর এরিক হবসবম [Eric Hobsbawm] বর্ণিত 'পুঁজির যুগে' [Age of Capital] বসবাস করি না, যেখান থেকে মানবেতর কর্ম পরিবেশ ও দীর্ঘ একঘেয়ে কর্মঘণ্টার ধারণার সূত্রপাত ঘটেছে। কিন্তু তারপরও প্রযুক্তিগত বিস্ময় ও বিপুল পরিমাণের রাষ্ট্রীয় সম্পদের যুগেও সময় এবং সময়ের অভাব একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কাজের চাপ আমাদের ধীরে ধীরে পিষ্ট করে ফেলে; স্কুলে যথাযথ ফলাফল করে ভালো চাকরি পাওয়ার চাপ থেকে চাকরিক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাচর্চা, যেখানে ছুটিরদিনেও কাজ করা এবং প্রতিনিয়ত চাকরির আবেদন করা, সিভি তৈরা করা একটি নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমাদের কর্মক্ষেত্র কেন এতটা সময় নিয়ে নেয় [এবং কর্মক্ষেত্রে কাটানো সময়ের প্রকৃতিই-বা কীরূপ]—এই চিন্তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কেন ইতিহাস জুড়েই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ কর্মঘণ্টার দীর্ঘতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।[২]

boobook

সময়, স্বাধীনতা এবং কাজ

সময় মানেই স্বাধীনতা। আরো স্পষ্ট করে বললে স্বাধীনতার ভিত্তি গঠনের জন্য সময় একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। আমাদের প্রকৃত সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ও যথাযথ মনোশারীরিক বিকাশের জন্য সময় অপরিহার্য। এর অভাবে আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পছন্দের কাজগুলো করতে ব্যর্থ হই। কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো আমাদের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য; যেমন, খাদ্য গ্রহণ, ঘুম ইত্যাদি। কিন্তু এর বাইরে যা রয়েছে তা হলো স্বাধীনতা উপভোগের সময়, এবং শেষ পর্যন্ত এটিই হলো আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ববহ প্রসঙ্গ।

অন্যদিকে পুঁজিবাদী বাস্তবতায়, সময় মানেই অর্থ। মানুষকে তার সময়ের বিনিময়ে মজুরি বা বেতন দেওয়া হয়। কিনে নেওয়া এই সময়ের মধ্যে চাকরিদাতা চেষ্টা করে শ্রমিকের কাছ থেকে যতটা সম্ভব আদায় করে নিতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সময় হলো লাভজনক ব্যবসা পরিচালনার আরেকটি উৎপাদন খরচ।

সময়ের ঠিক এই দিকটাকেই, অর্থাৎ স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ সময় এবং উৎপাদন ও মুনাফার মানদণ্ড স্বরূপ সময়ের মধ্যকার বৈপরীত্যকেই মার্কস দেখেছেন একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক হিসেবে। শ্রমিকের দৃষ্টিতে চাকরি হচ্ছে মজুরি গ্রহণের একটি উপায়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের [ও পরিবারের] চাহিদা মেটায়। এর বাইরে আমরা আশা করি, প্রাপ্ত মজুরির মাধ্যমে ব্যক্তি তার ইচ্ছা-আগ্রহগুলো পূরণ ও 'জীবন যাপন' করতে সমর্থ হবে। চাকরিজীবী হিসেবে আমাদের স্বার্থ হচ্ছে নিজেদের মজুরি আদায় করা; যার মাধ্যমে আমরা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারব, পাশাপাশি অবসর যাপনের, সামাজিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যও সংগ্রহ করতে পারব। পাশাপাশি একই মজুরির মধ্যেই মার্কস যাকে বলেছেন 'বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা', সেটা পূরণের পণ্যও আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। সমস্যাটা হলো, যে জীবন উপভোগ করার জন্য আমরা কাজ করি, সেই জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য যে সময়, সেটাও আমাদের নিয়োগকর্তারা আমাদের থেকে কেড়ে নিতে চায়।

নিয়োগকর্তার দৃষ্টিতে[৩] শ্রমিককে চাকরি দেওয়া হয় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য। শ্রমিক তার মালিকের জন্য মুনাফা

boobook

boobook
boobook

২

আনকোরা সম্ভাবনা: শ্রমসাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং মানবীয় সমৃদ্ধি

মানুষের চাওয়াটা এখানে যথেষ্ট স্পষ্ট। যে মানুষ কোনো-না-কোনো সময়ে কঠোর, নোংরা কিংবা বিপজ্জনক কাজ করেছে, কিংবা টানা একঘেয়ে কাজ করে গেছে, সে অবশ্যই চাইবে শ্রমসাশ্রয়ী প্রক্রিয়ার অগ্রগতি হোক।[১]

এমনকি কর্বিন কিংবা স্যান্ডার্সের সবচেয়ে আশাবাদী সমর্থককেও এটা স্বীকার করতে হবে যে, তাদের নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ গত ৪০ বছর যাবৎ নব্যউদারনৈতিক আধিপত্যের ফলে সৃষ্ট পুঁজিবাদী অবকাঠামো তার সর্বশক্তি দিয়ে এসকল নীতির বিরোধিতা করবে। গিলবার্ট বলেন, 'কে সরকারে আছে সেটা বিষয় নয়; সমাজের সার্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যই মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু।'[৩৮] অর্থাৎ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ৪ দিনের কর্মসপ্তাহের মতো র‍্যাডিকাল চিন্তা যেন পারস্পরিক সমর্থনের পদ্ধতিতে ক্ষমতা নির্মাণের প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম ধাপে, এই দাবি শ্রমিকদের প্রভূত কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে, যার অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তীকালে তৃণমূল পর্যায়ের সামাজিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সমর্থন অর্জন করতে হয়। জনগণের প্রবল চাপের মুখে এর লক্ষ্য হলো মধ্যমপন্থী ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ৪ দিনের কর্মসপ্তাহকে কেবল নির্বাচনের সময়ে সমর্থিত একটি বিষয় হিসেবে না রেখে ক্ষমতায় থাকাকালীন বাস্তবায়নযোগ্য একটি বিষয় হিসেবে দেখে।[৩৯]

সংক্ষেপিত কর্মসপ্তাহের জন্য লড়াই শেষ পর্যন্ত ঠিক এইটাই: একটা লড়াই। র‍্যাডিকাল নীতি প্রণয়নের কাজ হয়তো বামপন্থী পার্টির সদস্য, অ্যাক্টিভিস্ট, প্রগতিশীল চিন্তাবিদ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে জারি থাকবে, কিন্তু অবসর সময় আদায়ের লড়াইয়ে জিততে হলে কর্মক্ষেত্রগুলোতে শ্রমিকদের এবং বৃহত্তর সমাজের ক্ষমতায়ন আবশ্যক। এই পরিবর্তন কেবল ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মাধ্যমে সূচিত হবে না, একই সাথে যেসকল সামাজিক আন্দোলন এবং রাজনীতিবিদ বর্তমানের ঐতিহাসিক মুহূর্ত সম্পর্কে অবহিত, তাদের মাধ্যমেও ঘটবে। দীর্ঘস্থায়িত্ব, জেন্ডারভিত্তিক সাম্য, মানবীয় সমৃদ্ধি এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি বয়ান রচনা ও প্রচারের মাধ্যমেই আমরা আমাদের কর্মজীবনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হব।

boobook